রাজনীতি ও ভারতীয় নারী

ভারতে সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতিক ব্যবস্থা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাম্প্রতিককালে জনজীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই ভারতের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি অর্থবহ হয়ে উঠে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রেও কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার রীতিনীতির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে এ দেশের রাজনীতিক দলগুলি মুক্ত নয়। স্বভাবতই ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের অবদমিত অবস্থান এবং পুরুষের আধিপত্য অনস্বীকার্য। পঞ্চায়েত ও পৌর পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সংরক্ষণমূলক আইন আছে এবং তা অনুসরণ করা হয়। এই কারণে পঞ্চায়েত ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার সন্তোষজনক। কিন্তু রাজ্য স্তরে ও জাতীয় পর্যায়ে পরিস্থিতি হতাশার সৃষ্টি করে। বাস্তব অবস্থা হল রাজনীতির নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার কমতে থাকে। উচ্চতর পর্যায়ে রাজনীতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুপস্থিতির বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর অদ্যাবধি লোকসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার কখনই আট শতাংশের অধিক হয়নি। ১৯৮৯ সালে লোকসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা তুলনামূলক বিচারে সব থেকে কম ছিল। রাজ্য বিধানসভায় এবং সংসদের লোকসভায় তেত্রিশ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিষয় নিয়ে রাজনীতিক দলগুলির সদিচ্ছার অভাব লোকসভায় আলোচনায় নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মূলকথা হল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার রীতিনীতির নিগড় থেকে ভারতীয় রাজনীতির বন্দিদশা এখনও ঘোচেনি।

সনাতন ভারতে মহিলাদের জীবনধারা ছিল অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত—সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। জায়া-জননীর ভূমিকার মধ্যেই নারীজাতির জীবন পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। বিংশশতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এই অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা এই সময় সনাতন বিধি-নিষেধের অচলায়তন ছেড়ে এগিয়ে আসতে শুরু করে। পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে মহিলারাও এই সময় রাজনীতিক, প্রশাসনিক ও পেশাগত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অভিজাত ভারতীয় পরিবারের মহিলারা অন্তপুরের পর্দা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা রাখেন। বিভিন্ন নির্বাচনে ক্রমশ অধিকসংখ্যায় তাঁরা ভোট দেন। মহিলারা সরকারী চাকরিতে যোগ দিতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় মহিলারা নির্বাচিত হন। কালক্রমে মহিলারা বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্যের রাজ্যপাল, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ও অ-রাজনীতিক পদে আসীন হন।

SaketSirSociology

Scanned with CamScanner

মহিলাদের অবস্থান উপেক্ষিত ॥ উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকাগত পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং মহিলাদের মর্যাদার উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্য রহিত। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ভারতে মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কিত ভারত সরকারের একটি কমিটির প্রতিবেদনের বক্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অবস্থান ও ভূমিকা অভিপ্রেত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে নি। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এই অধিকারের স্বীকৃতি দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক প্রক্রিয়ার অংশীদার বা উপাদান হিসাবে মহিলাদের ভূমিকাকে উপযুক্ত মর্যাদাযুক্ত করতে পারে নি। রাজনীতিক ক্ষমতা ও সাম্যের ক্ষেত্রে এই আইনগত স্বীকৃতি এক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এক ধারণার সৃষ্টি করেছে। পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা ঠিক। কিন্তু রাজনীতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার মত কার্যকর ক্ষমতা মহিলাদের হাতে আসে নি। আর যদিও বা কিছু রাজনীতিক ক্ষমতা মহিলাদের হাতে এসে থাকে, তা বাস্তবে নগণ্য। সংখ্যাগত বিচারে মহিলারা সংখ্যালঘু নয়। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষমতা, শ্রেণী ও মর্যাদার বিচারে মহিলাদের অবস্থান উপেক্ষিত। রাজনীতিক দলগুলির কাছে মহিলারা সাধারণভাবে পুরুষের অনুগামী পরছায়া হিসাবে পরিগণিত হয়। মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিষয়টি অসংগঠিত ও অসংহত। অসাম্য-বৈষম্যের ব্যাপারে তাদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে নানারকম অসঙ্গতি বা পরস্পর বিরোধিতা বর্তমান। তারফলে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের মর্যাদা ও ভূমিকা বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়েছে। উল্লিখিত কমিটি তার প্রতিবেদনে আরও বলেছেন যে, রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনে তারা অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে। তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করতে এখন অনেক বেশী আগ্রহী। কিন্তু দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক প্রক্রিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকা এখনও অনেকাংশে গুরুত্বহীন। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে মহিলাদের মধ্যে রাজনীতিক শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারে এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সক্রিয় করার ব্যাপারে রাজনীতিক দলগুলি উদ্যোগহীন। তাছাড়া অধিকাংশ রাজনীতিক দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সনাতন সমাজের চলে আসা বিবিধ সংস্কার ও মনোভাবের প্রভাব থেকে রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গও মুক্ত নন। আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর দু'দশকের অধিককাল ইতিমধ্যে অতিবাহিত। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির মূল বক্তব্য বর্তমানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে এমন কথা বলা যায় না।

মার্কসীয় ব্যাখ্যা ॥ ভারতের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার গুরুত্বহীনতা মার্কসবাদীরা ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিককালের পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রকৃতি মহিলাদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা করে। প্রচলিত মতাদর্শ মহিলাদের উপর প্রতিবন্ধকতামূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারফলে বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে বা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে মহিলারা উদ্যোগী হন না বা হতে পারেন না। সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুগত থাকার ও অনুগত জীবনযাপনের ব্যাপারে আবহমান কাল থেকে মহিলাদের সামাজিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বা বাধ্য করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে মহিলাদের সাম্য, সমানাধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত। তা ছাড়া এ দেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের স্বার্থেও সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু চলে আসা সমাজব্যবস্থার সাবেকি ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান ও তার গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা সামঞ্জস্যহীন ও সংঘাতপূর্ণ। এ রকম এক সামঞ্জস্যহীন রাজনীতিক

Scanned with CamScanner

সামাজিকীকরণ মহিলাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। এই কারণে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যাপারে মহিলাদের দিক থেকে অসুবিধা দেখা দেয়।

নির্বাচন ও রাজনীতিক অংশগ্রহণ ।। গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থায় দু'দিক থেকে রাজনীতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা যায় ঃ এক, নাগরিকদের রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও গুরুত্ব আরোপ এবং দুই, ক্ষমতা অধিগ্রহণ ও প্রয়োগ। এই দুটি পর্যায়ে জনগণের রাজনীতিক অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যাবে। এবং এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী পর্যালোচনার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বিরোধ-বিতর্কের উর্ধ্বে। ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত আলোচিত সাধারণ নির্বাচনগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সম্যকভাবে সংকলন বা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় নি। নির্বাচন কমিশন আগে নির্বাচন সম্পর্কিত যে সমস্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে মহিলা প্রার্থীদের আলাদা করে চিহ্নিত করা হয় নি। কমিশনের প্রতিবেদনে মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা এবং তাদের ভোটের হারও হিসাব-নিকাশ করে দেখান হয় নি। তবে কমিশনের পরবর্তী কালের প্রতিবেদনসমূহে মহিলা প্রার্থীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দেখান হয়েছে। তবে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে কমিশন তার প্রতিবেদনে মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা ও শতকরা হিসাব এবং তাদের প্রদত্ত ভোট ও তার শতকরা হিসাব পৃথকভাবে পর্যালোচনা করেছে। পুরুষ ভোটদাতাদের সংখ্যা ও তাদের প্রদত্ত ভোটের শতকরা হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মহিলা ভোটদাতা ।। প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, পুরুষ ভোটদাতাদের তুলনায় মহিলা ভোটদাতাদের ভোট প্রদানের হার কম। পুরুষের তুলনায় মহিলারা কম হারে ভোট দেন—এই তথ্য বা সিদ্ধান্ত বিভিন্ন গবেষণা সূত্রে ব্যাপকভাবে সমর্থিত। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী পর্যালোচনায় এবং গবেষণামূলক অনুসন্ধানে সিদ্ধান্তটি স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছে।

নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার ব্যাখ্যা ।। নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। নির্বাচনী অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানকারী উপাদানসমূহের ব্যাপারে মহিলাদের অবস্থান প্রতিকূল। সাধারণভাবে ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম নিয়ে ভারতীয় মহিলাদের অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হয়। ঘরকন্যার বিবিধ কাজে তাঁদের মোট সময়ের অধিকাংশটাই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই কেটে যায়। প্রকৃতিগত ভাবে ভারতীয় মহিলারা রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাদী। এঁদের উপর গণ-মাধ্যমসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তুলনামূলক বিচারে অনেক কম। স্বভাবতই সমকালীন পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার মান নীচু হয় এবং জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। তা ছাড়া আমাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষ-প্রধান সমাজে মহিলারা স্বভাব বশেই পুরুষসঙ্গীর অনুগামী হয়। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মানসিক গঠন এবং আচার-আচরণের প্রকৃতি এ রকমই হয়ে থাকে। ঘরের বাইরের যাবতীয় বিষয়ে মহিলারা পুরুষ-নির্ভর। আবার মুষ্টিমেয় যে সমস্ত মহিলা গণ-মাধ্যমসমূহের সংস্পর্শে আসেন, তাঁরাও রাজনীতিক বিষয়াদিতে আগ্রহ দেখান না। চাকুরীজীবী বা কর্মরত মহিলারা রাজনীতিক সংবাদাদির পরিবর্তে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের প্রতি আকৃষ্ট হন। নিজের চাকরির দায়িত্ব পালনের পর পরিবার-পরিজনের পরিচর্যায় তাঁদের সময়ের অনেকটাই চলে যায়। অতঃপর রাজনীতিক বিষয়াদিতে তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না। আবার যাঁরা চাকরি করেন না, বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নিতান্তই কম। সমকালীন রাজনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান বা ধারণা তাঁদের থাকে না। পরিবার-পরিজনের ভাল মন্দের বাইরে তাঁরা রাজনীতিক ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চান না। ভোট দেওয়ার ব্যাপারেও

SaketSirSociology

Scanned with CamScanner

তাঁদের তেমন আগ্রহ থাকে না। এই সমস্ত কিছুর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাজনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের সচেতনতা, সক্ষমতা ও বিচক্ষণতা কম হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে সম্পাদিত গবেষণামূলক অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায় যে, রাজনীতিক অংশগ্রহণমূলক কাজকর্মে পুরুষের থেকে মহিলারা অনেক পিছিয়ে । দেশের সাধারণ রাজনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের সক্রিয়তার হার অনেক কম। সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নতর স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে এ কথা অধিকতর সত্য ও প্রাসঙ্গিক। সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নতর স্তরে অবস্থিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এ সত্য হলেও, উচ্চতর স্তরে অবস্থিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও এলিট শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না। এই শ্রেণীর মহিলাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের হার পুরুষদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের হারের থেকে সামান্যই পৃথক।

ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য কমছে ॥ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে রাজনীতিক অংশগ্রহণের হারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমছে। মহিলাদের ভোট প্রদানের হার বাড়ছে। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন, ঘরের বাইরের চাকরি-বাকরি, পেশাগত অন্যান্য ভূমিকা প্রভৃতি ঐতিহ্যবাদী ভারতীয় মহিলাদের মনোভাব-মানসিকতায় পরিবর্তন সূচিত করেছে। শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ, আধুনিক গণ-মাধ্যমসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ঘরের বাইরের চাকরি প্রভৃতি মহিলাদের মানসিক গঠনে পরিবর্তন এনেছে এবং রাজনীতিক অংশগ্রহণের হারকে ইতিবাচক দিকে প্রভাবিত করেছে। ডঃ সংঘমিত্রা সেন চৌধুরী (Sanghamitra Sen Chaudhuri) তাঁর *Women and Politics : West Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: ".... scholars generally agree that sex differences in political participation are diminishing. Milbrath and Goel hold that 'economic and social modernization is slowly eroding this sex differences.'' পশ্চিমবঙ্গের একটি পরিসংখ্যান দিয়ে অধ্যাপিকা সেন চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, নারী ও পুরুষ ভোটদাতাদের প্রদত্ত ভোটের শতকরা হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। উল্লেখ করার মত বিষয় হল যে ১৯৮৭ সালে মহিলাদের প্রদত্ত ভোটের হার পুরুষদের প্রদত্ত ভোটের হারের থেকে অধিক ছিল। অধ্যাপিকা সেন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলের মহিলা ভোটদাতাদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মহিলা ভোটদাতাদের ভোট প্রদানের হার অধিক। তিনি বলেছেন: The survey data indicate that in West Bengal the rural women's turnout was higher than the urban women's turnout."

মহিলা প্রার্থীদের সম্ভাবনা ॥ এ প্রসঙ্গে মহিলা রাজনীতিবিদ বা প্রার্থীদের নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনা ও হারের বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা বরাবরই কম। অর্থাৎ মহিলাদের মোট সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধিত্বের হার কম। এই পরিস্থিতি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেকের অভিমত অনুযায়ী মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার কম হওয়ার কারণ মহিলাদের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত আছে। রাজনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের আগ্রহের অভাব অবিদিত নয়। আবার সাধারণভাবে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেই অনেকে অধিকতর সক্রিয়তা ও কিছুটা জঙ্গী ভাবের অস্তিত্ব পছন্দ করেন। কিন্তু এ বিষয়েও মহিলারা পিছিয়ে। সর্বোপরি এ বিষয়ে ভোটদাতাদের একটি অংশের মধ্যে এবং কিছু রাজনীতিক নেতার মধ্যে অল্পবিস্তর কুসংস্কারের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। কোন কোন গবেষক-চিন্তাবিদ্ এমন কথাও বলেছেন যে, অনেক রাজনীতিকের মধ্যে ও নির্বাচনী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে মহিলা প্রার্থীদের ব্যাপারে কুসংস্কারের

Scanned with CamScanner

অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। অধ্যাপিকা সেন চৌধুরীর মতানুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা হতাশাজনক। তবে সামগ্রিক বিচারে ভারতের বিভিন্ন নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে বর্তমানে রাজনীতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে ইতিবাচক আইন প্রণীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনে মহিলা প্রার্থীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যাই হোক আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা কম হওয়ার কারণে মন্ত্রিসভায় এবং উচ্চতর রাজনীতিক পদসমূহে মহিলাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

SaketSirSociology

মহিলাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর বিবিধ আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা-দীক্ষা, বয়স, বৃত্তি প্রভৃতি মহিলাদের রাজনীতিক আচার-আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক বিবিধ উপাদান গঠিত ও প্রভাবিত হয়। এবং এই সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক প্রভাবের ফলে ব্যক্তি-মানুষের আচার-ব্যবহার, বিশেষত রাজনীতিক অংশগ্রহণের ধারা প্রভাবিত হয়। কারণ বিভিন্ন প্রকারের রাজনীতিক অংশগ্রহণের সহায়ক উপাদানসমূহ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল সূত্রেই পাওয়া যায়। মহিলাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণ প্রসঙ্গেও এ কথা সমভাবে সত্য। রাজনীতিক অংশগ্রহণের অভিব্যক্তি বিভিন্নভাবে ঘটে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে রাজনীতিক অংশগ্রহণ ঘটে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ; জনসভায় যোগদান; রাজনীতিক পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ রকম রাজনীতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার নিতান্তই কম। আবার রাজনীতির এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষদের অংশগ্রহণের হারও খুব বেশী নয়।

ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা ॥ সাধারণভাবে এ কথা স্বীকৃত যে, নির্বাচনে ভোট না-দেওয়ার হার মহিলাদের মধ্যেই অধিক। বিভিন্ন গবেষণামূলক অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায় যে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে এবং শহরাঞ্চলের অধিবাসী মহিলাদের মধ্যে নির্বাচনে ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকার প্রবণতা কম। তা ছাড়া যে সমস্ত মহিলা অ-কৃষিমূলক বৃত্তিতে নিযুক্ত এবং আর্থিক অবস্থা ভাল, তাদের মধ্যেও নির্বাচনে ভোট না-দেওয়ার সংখ্যা কম। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি নির্বাচনে ভোট প্রদানের সঙ্গে সদর্থকভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মহিলারা সাধারণত ভোটপ্রদান থেকে বিরত থাকেন না। কিন্তু অধ্যাপিকা সেন চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গে সম্পাদিত তাঁর গবেষণামূলক অনুসন্ধান সূত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের থেকে শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে ভোট না-দেওয়ার প্রবণতা অধিক। অর্থাৎ নির্বাচনে ভোট না-দেওয়ার সংখ্যা গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের থেকে শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যেই অধিক। এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপিকা সেন চৌধুরি বিবিধ কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতানুসারে শহরাঞ্চলে বসবাসের কারণে রাজনীতিকদের সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। ভোট দেওয়াটাকে তাঁরা দায়িত্ব বা কর্তব্য বলে মনে করেন না। নগরবাসী মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের রাজনীতিক নিন্দাবাদ দেখা দেয়। অপরদিকে গ্রামবাসী মহিলারা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব সচেতন। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের কর্তব্যবোধ কাজ করে। তাঁদের মধ্যে রাজনীতিক নিন্দাবাদ অনুপস্থিত।

অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে ভারতীয় মহিলাদের রাজনীতিক সচেতনতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী ভারতে রাজনীতিক সচেতনতা সম্পন্ন মহিলার সংখ্যা অত্যন্ত কম। মহিলারা সাধারণত কোন রাজনীতিক দলের সক্রিয় সদস্য হন না। খুব কম সংখ্যক মহিলাই নির্দিষ্ট কোন রাজনীতিক দলকে সমর্থন

Scanned with CamScanner

করেন। নির্বাচনের উদারনীতিক মতবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক ভোটদাতা সাধারণত তাঁর পছন্দ অনুসারে প্রার্থী বা দলকে ভোট দেন। কিন্তু মহিলাদের নির্বাচনী আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একথা খাটে না। সাধারণত স্বামীর রাজনীতিক বিশ্বাস ও মনোভাব অনুযায়ী স্ত্রী তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ মহিলাদের নির্বাচনী আচরণ রাজনীতিক সামাজিকীকরণ বা রাজনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অধ্যাপক আহুজার সমীক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকার যুক্ত মহিলাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। অধ্যাপক আহুজার মতানুসারে এই পরিসংখ্যান মহিলাদের রাজনীতিক সচেতনতার পরিচয়বাহী নয়। ভোট দিতে যাওয়ার নামে মহিলারা বাইরে বেরোবার এক সুযোগ পায় এবং সাধারণত তার সদ্ব্যবহার করে।

Scanned with CamScanner

সাংবিধানিক অধিকার ও অন্যান্য আইনানুমোদিত অধিকার এবং ভারতীয় নারী

সনাতন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন অনেকাংশে সদর্থক ও প্রগতিমূলক। এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদাগত অবস্থানের উন্নতি ঘটেছে বা নারী অবদমনের অবসান ঘটেছে, এমন কথা বলা যাবে না। মহিলাদের নিরক্ষরতা এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। বস্তুত নিরক্ষরতা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটি বড় ব্যাধি। এই ব্যাধিটি সমাজজীবনের অল্পবিস্তর সকল বিষয়কেই কম-বেশী প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৯১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হল নিরক্ষর। মহিলাদের ক্ষেত্রে অবস্থা অধিকতর হতাশাব্যঞ্জক। মোটামুটি মহিলাদের মধ্যে তিন-পঞ্চমাংশই হল নিরক্ষর। নিরক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি প্রভৃতিও নারী অবদমন ও নারীজাতির মর্যাদাগত হীনতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তবে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার অপসারণ রাতারাতি সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সদর্থক এবং প্রগতিশীল প্রবল জনমত গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু এটাও খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন ব্যবস্থা বা অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রগতিমূলক নানা আইন প্রণয়ন করা যায় এবং করা হয়েছে। এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে ভারতের মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

SaketSirSociology

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে পুরুষের মত মহিলাদেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত তৃতীয় অধ্যায় ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের অন্যান্য অংশে অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ ও আলোচনা আছে। সংশ্লিষ্ট অধিকারগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে

Scanned with CamScanner

৩৫ধারার মধ্যে মৌলিক অধিকারসমূহের আলোচনা আছে। মূল সংবিধানে সাত শ্রেণীর মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। ৪৪তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৮)-র এর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ পড়েছে। সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে সাধারণ আইনগত অধিকারে পরিণত হয়েছে এবং ৩০০ (ক) ধারায় সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সংবিধানে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট আছে।

১। সাম্যের অধিকার ॥ সাম্যের অধিকারের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, আইনের সমান সংরক্ষণ, নারী-পুরুষ বিচারে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধকরণ, সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিচারে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকলের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার সাধু সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনার এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ এই পাঁচটি ধারায় সাম্যের অধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমেও আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়-নীতির কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া সংবিধানের ৩২৬ ধারায় রাজনীতিক সাম্যের উল্লেখ আছে। আবার প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের মাধ্যমেও সাম্যের নীতিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

SaketSirSociology

২। স্বাধীনতার অধিকার ॥ সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ও ভারতের যে কোন জায়গায় বসবাস করার, বৃত্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২১ ধারায় জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ॥ সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে নিয়ে ব্যবসা বা বেগার খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দাসপ্রথা, স্ত্রীলোককে দিয়ে অনৈতিক কাজ করান ও বিনা বেতনে কাজ করান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ॥ সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ ধারার মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আছে। বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ধর্ম স্বীকার, ধর্ম আচরণ ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে সংবিধানের ২৫ ধারায়।

৫। সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার ॥ সংস্কৃতি বা জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে অধিকারের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ২৯ ও ৩০ ধারায়।

৬। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ॥ সংবিধানের ৩২ থেকে ৩৫ ধারায় মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিকার দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিই সব নয়। মহিলাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং নারীজাতির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদনের স্বার্থে রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বিশেষাধিকারমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। এই সমস্ত আইনের উদ্দেশ্য হল ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এ রকম একাধিক আইন প্রণয়ন করেছে।

সামাজিক আইনসমূহ ও নারীজাতির স্বার্থ

বিবাহ ব্যবস্থা ॥ সামাজিক আইনসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ

Scanned with CamScanner

বিষয়াদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: বিবাহ, দত্তকগ্রহণ এবং গর্ভপাত। বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলি হল: '১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহ আইন' (Widow Remarriage Act, 1856) '১৯৫৪ সালের বিশেষ-বিবাহ আইন' (Special Marriage Act, 1954) এবং ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন' (Hindu Marriage Act, 1955)। বিবাহ সম্পর্কিত উল্লিখিত আইনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হল: বিবাহের বয়স, বহু বিবাহ, জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন, বৈধ-অবৈধ বা সিদ্ধ-অসিদ্ধ বিবাহ, দাম্পত্য জীবনের অধিকারসমূহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, খরপোষ, পণপ্রথা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি।

দত্তক গ্রহণ ॥ দত্তক গ্রহণের বিষয়টিও সামাজিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। শিশুদের দত্তক হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কিত আইন প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে। এই আইনটির নাম হল ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956)। বিবাহিত মহিলা, অবিবাহিত মহিলা, বিধবা মহিলা এবং বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মহিলারা শিশুকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করার অধিকার ভোগ করেন। তবে দত্তক হিসাবে যাকে গ্রহণ করা হবে তার বয়স হতে হবে পনের বছরের নীচে এবং তাকে অবিবাহিত হতে হবে।

গর্ভপাতের অধিকার ॥ গর্ভপাতের বিষয়টিও মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত। এবং এই বিষয়টি সামাজিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭০ সাল অবধি গর্ভপাত ফৌজদারী এবং দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হত। ১৯৭১ সালে গর্ভপাতের অধিকার স্বীকার করে একটি আইন প্রণীত হয়। সংশ্লিষ্ট আইনটির নাম হল 'Medical Termination of Pregnancy Act'। এই আইনটি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কার্যকর হয়। এই আইনে সন্তানসম্ভবা মহিলাকে এবং গর্ভপাতকারীকে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হয়। গর্ভপাতকারী চিকিৎসক হবেন একজন নিবন্ধীকৃত ডাক্তার। গর্ভাবস্থা বার সপ্তাহের অধিক হওয়া চলবে না। গর্ভপাতের অধিকার ভোগের জন্য কতকগুলি অনুমোদিত কারণের কথা আইনে বলা হয়েছে। ধর্ষণের কারণে সৃষ্ট গর্ভাবস্থা এবং গর্ভনিরোধক ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট গর্ভাবস্থা নষ্ট করা যাবে। গর্ভবতী মহিলার শরীর-স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য গর্ভপাত করা যাবে। সন্তান জন্মালে মায়ের শরীর ও মন ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা থাকলে গর্ভপাত করা যাবে। সন্তান জন্মালে সেই সন্তান শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে গর্ভপাত করা যাবে।

আর্থনীতিক আইনসমূহ ও নারীজাতির স্বার্থ

মহিলাদের আর্থনীতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সহায়ক আর্থনীতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর্থনীতিক স্বার্থ ও আর্থনীতিক আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি হল: সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, সমান মজুরী, চাকরির নিরাপত্তা, মাতৃ কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা, কাজের পরিবেশ প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (Hindu Succession Act, 1956) প্রণীত হয়। এই আইনে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সহায়ক বিধি-ব্যবস্থার কথা আছে। ১৯৪৮ সালে প্রণীত হয় কারখানা আইন (Factory Act, 1948)। এই আইনে কাজের পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল, মাতৃকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি এবং চাকরির নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা আছে। সমমজুরী সম্পর্কিত আইন প্রণীত হয় ১৯৭৬ সালে। এই আইনটির নাম হল: ১৯৭৬ সালের সমমজুরী আইন (Equal Remuneration Act, 1976)।

সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার ॥ ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে 'স্ত্রীধন' ও 'অ-স্ত্রীধনে'র মধ্যে পার্থক্যকে দূর করেছে। সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার বলতে জায়া-জননী এবং অবিবাহিতা কন্যা ও বিধবা নারী হিসাবে মহিলার অধিকারকে বোঝায়। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে

SaketSirSociology

Scanned with CamScanner

পিতার সম্পত্তিতে ভ্রাতাদের সঙ্গে কন্যাদেরও সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে। আবার প্রয়াত পতির সম্পত্তিতে পুত্রকন্যাদের সঙ্গে বিধবা পত্নীও সমানাধিকার ভোগ করে।

কারখানায় নারী শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা ।। ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার কথা আছে। কোন কারখানায় মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীদের সংখ্যা যদি তিরিশ বা তার বেশী হয়, তা হলে কারখানার কর্তৃপক্ষকে মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীর শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধানের জন্য ক্রেইশ (Creche)-র মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়। তা ছাড়া সকল কারখানাতেই মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীদের কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হয়। মহিলাদের কাজের সময় দিনের বেলা দশটা-পাঁচটার মধ্যে হতে হবে। এবং এক দিনে ন'ঘণ্টার অধিক মহিলাদের কাজ করান যাবে না। আবার পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকল শ্রমিকের জন্য কারখানায় কিছু সুযোগ-সুবিধা বা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রাত্যহিক কাজের সময়সীমা, সাপ্তাহিক বিশ্রাম, কারখানায় বিশ্রামকক্ষের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, কর্মরত অবস্থায় মেশিন থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

সমমজুরী ।। ১৯৭৬ সালের সমমজুরী আইনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অভিন্ন কাজের জন্য সমমজুরীর কথা বলা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মধ্যে পারিশ্রমিকের ব্যাপারে পার্থক্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইন অমান্যের কারণে অমান্যকারী নিয়োগকর্তার শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

SaketSirSociology

রাজনীতিক অধিকারসমূহ ও নারীজাতি

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নারীজাতির জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের এই দুটি সাংবিধানিক রাজনীতিক অধিকার হল : নারী ভোটাধিকার এবং আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে (The Government of India Act, 1935) শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলাদের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকার করা হয়। অনতিবিলম্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ছাপান্ন জন মহিলা আইনসভায় আসন লাভ করেন। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকার পরিধি প্রসারিত হয়। এই সময় মহিলা ভোটদাতার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য আইনসভাগুলিতে ও সংসদে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

১৯১৭ সালে মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। ১৯১৮ সালে এই দাবি ব্রিটিশ সরকার বাতিল করে দেয়। তবে পরের বছরই ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার মহিলাদের ভোটাধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করে। সমকালীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করে আইন প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯২৩ সালে রাজকোটে; পরের বছর ১৯২৪ সালে ট্রাভানকোর ও কোচিনে; তারপরের বছর ১৯২৫ সালে মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশে; তারপরের বছর ১৯২৬ সালে অসম ও পঞ্জাবে এবং ১৯২৯ সালে উড়িষ্যা ও বিহারে নারী-ভোটাধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণীত হয়।

ভারতে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে মহিলাদের বহু ও ব্যাপক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী অন্যান্য দেশের মহিলাদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে মহিলাদের অধিকারের সংখ্যা ও পরিধি অধিকতর ব্যাপক। এ বিষয়ে

Scanned with CamScanner

দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে নিজেদের আইনানুমোদিত অধিকারসমূহ সম্পর্কে ভারতের মহিলাদের সচেতনতার মান ও পরিধি প্রসঙ্গে বিতর্কের অবকাশ আছে।

অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞানী আহুজা (Ram Ahuja) রাজস্থানের কয়েকটি গ্রামের মহিলাদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা সম্পাদন করেন। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা সূত্রে অধ্যাপক আহুজা মহিলাদের অধিকার-সচেতনতা সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। অধ্যাপক আহুজার মতানুসারে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বীকৃত অধিকারসমূহের ব্যাপারে মহিলাদের সচেতনতার মান ও ব্যাপকতা চারটি মূল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এই চারটি বিষয় হল : সংশ্লিষ্ট মহিলার ব্যক্তিগত পটভূমি, সামাজিক পরিবেশ, আত্মবাদী উপলব্ধি এবং আর্থনীতিক ভিত্তি। শিক্ষাগত মান, ব্যক্তিগত বিভিন্ন চাহিদা, উচ্চাশার পর্যায় প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলার ব্যক্তিগত পটভূমি নির্ধারিত হয়। আত্মীয়-পরিজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিবারের সদস্যদের ধ্যান-ধারণা, স্বামীর মূল্যবোধসমূহ প্রভৃতি মহিলার সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। মহিলার মর্যাদা ও ভূমিকার দ্বারা আত্মবাদী উপলব্ধি (subjective perception) নির্ধারিত হয়। মহিলা কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তার দ্বারা তাঁর আর্থনীতিক ভিত্তি স্থিরীকৃত হয়।

SaketSirSociology

Scanned with CamScanner